**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী**

**ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উপলক্ষে বিশেষ ফিচার**

**বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক**

অজয় দাশগুপ্ত

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে উপাচার্যকে অবরোধ করেছিলেন। এটা ছিল ১৯৪৯ সালের ১৮ ও ১৯ এপ্রিলের ঘটনা। তিনি অবস্থান নিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবেতনভোগী কর্মচারীদের পক্ষে। উপাচার্য পুলিশ ডেকে তাকে গ্রেফতার করান, স্থান হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে।

 এ ঘটনার ২৩ বছর পর ১৯৭২ সালের ২০ জুলাই বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যকে অবরোধমুক্ত করতে এসেছিলেন। তখন তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতা। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী উপাচার্যসহ কয়েকজন বরেণ্য শিক্ষককে অবরোধ করে রেখেছিল পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়াই পাস করিয়ে দেওয়ার দাবিতে। উপাচার্য পুলিশ ডাকেননি। প্রধানমন্ত্রীর কাছে অবরোধের খবর যায়। তিনিও পুলিশকে হুকুম দেননি। নিজে ছুটে এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অটোপ্রমোশনের অন্যায় দাবি তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের ভৎর্সনা করেন। শিক্ষকদের অসম্মান করার জন্য প্রকাশ করেন তীব্র ক্ষোভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এমন অভিভাবকই তো আমরা চাই।

 বঙ্গবন্ধু সর্বদা ন্যায় ও সত্যের পক্ষে ছিলেন। অনন্য মানবিক গুণাবলীর কারণে তিনি সকলকে সহজেই মুগ্ধ করতেন। নেতৃত্বগুণে তাঁর জুড়ি ছিল না। পরিস্থিতি যত কঠিন হোক, প্রয়োজনে দুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারতেন। সংকল্পে থাকতেন অটল, নমনীয় হতেও ছিল না সঙ্কোচ। ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অবরোধ’-২৩ বছরের ব্যবধানের দুটি ঘটনার প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। প্রথমটিতে বঙ্গবন্ধু প্রতিবাদী ভূমিকায়। ছাত্র আন্দোলন থেকে কিছুদিন আগে বিদায় নিয়েছেন। তবে আইন বিভাগে পড়াশোনা করছেন। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নতুন যে রাজনৈতিক শক্তি গড়ে উঠছে, তার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন সহকর্মীদের। কৃষকদের পাশেও দাঁড়াচ্ছেন বিভিন্ন জেলায়। মার্চ (১৯৪৯) মাসের প্রথম দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গিয়েছিলেন ধানকাটা কৃষি শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কথা বলার জন্য। সেখান থেকেই ঢাকা ফিরে জানলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের সামান্য সুবিধা বৃদ্ধির দাবিও মানতে নারাজ। অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে লিখেছেন, ‘এখন এটাই পূর্ব বাংলার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্র অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কর্মচারীদের সংখ্যা বাড়ে নাই।... চাউলের দাম ও অন্যান্য জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। চাকরির কোনো নিশ্চয়তাও ছিল না। ইচ্ছামত তাড়িয়ে দিত, ইচ্ছামত চাকরি দিত’।

 কর্মচারীরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট ডেকেছে। তাদের সমর্থনে ছাত্রলীগ ধর্মঘট ডেকেছে ছাত্রদের। কর্তৃপক্ষ দমননীতির পথ গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। কয়েকজন কর্মচারীকে বরখাস্ত করে। তাদের পাশে দাঁড়ানোর অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ২৭ জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। ছাত্রত্ব কেড়ে নিয়ে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করা হয়। এমন প্রেক্ষাপটেই তাঁর সিদ্ধান্ত- উপাচার্যের বাসভবনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন। ১৮ এপ্রিল মিছিল নিয়ে গেলেন উপাচার্যের বাসভবনে। রাতেও অবস্থান বজায় থাকল। ১৮ এপ্রিলের গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘উপাচার্যের বাসভবনে ছাত্রদের সভায় শেখ মুজিবুর রহমান ও গোলাম মহম্মদ বক্তৃতা করেন। তারা বলেন, আগামীকাল সকালে উপাচার্যের বাসার কাজের লোকদের বাজারে যেতে দেওয়া হবে না।

 পরদিন বিকেলের দিকে পুলিশ তাকেসহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ক্ষমা ভিক্ষা করে বন্ড প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি সেটা প্রত্যাখান করেন। তাঁর জেলে থাকার সময়ে একটি ঘটনা আমরা জানতে পারি ‘সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টালিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দি ন্যাশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। এতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের আন্দোলন, কয়েকজন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১৯৪৯ সালের ৯ মে নিরাপত্তা বন্দি শেখ মুজিবুর রহমান ও চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরীর (পরবর্তীকালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ স্পীকার, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগী) মধ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত গোয়েন্দা বিভাগের কর্মী জানান, ফজলুল কাদের চৌধুরী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে জানতে চান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তিনি আপোশে প্রস্তুত কীনা। উত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান জানান, তিনি সম্মানজনক মীমাংসায় রাজী আছেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিঃশর্তে কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা শাস্তিমূলক পদক্ষেপ প্রত্যাহার করতে হবে। তিনি নিজে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত নন। ফজলুল কাদের চৌধুরী বলেন, আমাদের দু’জনের মধ্যে সম্পর্ক পুরানো। আমি কি আপনার হয়ে আপোশের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালাতে পারি? উত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান পরদিন এ বিষয়ে তাঁর শর্ত জানানোর কথা বলেন। ১০ মে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে লিখিতভাবে পাঠানো শেখ মুজিবুর রহমানের চারটি শর্ত ছিল এমন যে-

-২-

 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিঃশর্তভাবে প্রত্যাহার করতে হবে; গোটা পূর্ব পাকিস্তানে আটক ছাত্রবন্দিদের নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে; নতুন করে কাউকে হয়রানি করা চলবে না এবং সংবাদপত্রের ওপর জারি করা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

 বঙ্গবন্ধু আপোশ করেননি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের আন্দোলনের পাশে থাকার জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তিনি থাকলেন বাতিঘর হয়ে। এভাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের অবসান ঘটলেও জীবনের পাঠ গ্রহণ থেকে মূহূর্তের জন্য নিবৃত্ত থাকেননি। কেবল একটি প্রতিষ্ঠান নয়, গোটা দেশ এবং বিশ্ব পরিণত হয় তাঁর পাঠশালায়। যে প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হয়, সেখানের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরাও তাঁর প্রতি মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। মাত্র তিন বছরের মধ্যে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব দেয় বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। সৃষ্টি হয় ১৯৫২ সালে একুশে ফেব্রুয়ারির অমর বীরত্বগাঁথা। এ ঐতিহাসিক ঘটনার মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ফিল্ড মার্শাল আইযুব খানের সামরিক শাসন চ্যালেঞ্জ করে। পরের কয়েক বছরের মধ্যেই এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ উদ্যোগী হয়ে এ ভূখণ্ডের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে ছাত্রগণ অভ্যুত্থান সৃষ্টি করে, যার পরিণতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিল হয়ে যায়, তিনি ‘বঙ্গবন্ধু’ হিসেবে সকলের কাছে সমাদৃত হন। এ পরম সম্মান ও গৌরব অর্জনের দু’ বছর যেতে না যেতেই তাঁর আহ্বানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ছাত্রসমাজ উত্তোলন করে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত সরকার এ পতাকাকেই গ্রহণ করে নেয় জাতীয় পতাকা হিসেবে। এ যে অন্যন্য এক গৌরব-কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।

 বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর প্রথম তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আসেন ১৯৭২ সালের ৬ মে। এ দিন তাকে ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ প্রদান করা হয়। দৈনিক ‘সংবাদ’ পরদিন জানায়, ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে অন্যায়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কারের আদেশের অনুলিপি অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

 বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী পদার্পনের প্রেক্ষাপট ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত। যে ছাত্রসমাজ স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করায় অনন্য ভূমিকা রেখেছে, রণাঙ্গনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে লড়েছে অমিতবিক্রমে তাদেরই একটি অংশ কেন অটোপ্রমাশনের দাবি তুলবে? বঙ্গবন্ধু ৬ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে বলেছিলেন। তিনি বলেন, ‘দখলদার বাহিনী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের, বুদ্ধিজীবী-বিশেষজ্ঞদের হত্যা করতে হবে। সেটা তারা করেছে। ছাত্রছাত্রীদের এই শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে।’

 স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন- মুক্তিযুদ্ধকালে ছাত্রছাত্রীরা যে যে ক্লাসে অধ্যয়নরত ছিল সে ক্লাসেই থাকবে। প্রায় একবছরে তাদের শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে গেছে। এ জন্য যে ক্ষতি হয়েছে সেটাকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য আত্মত্যাগ হিসেবে গণ্য করতে হবে। এ অবস্থায় অটোপ্রমোশন দাবি ছিল অন্যায়, আত্মঘাতী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ এ দাবির বিরোধিতা করে। এ কারণে অটোপ্রমোশন দাবি করা একদল ছাত্র ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক মাহবুবজামান ও জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক অজয় দাশগুপ্তকে লাঞ্ছিত করে। এ ছাত্ররাই পরে উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় তখন রমনা পার্কের কাছে পুরাতন গণভবনে। উপাচার্যকে অবরোধ করে রাখার খবর পেয়ে তিনি ছুটে আসেন। ২২ জুলাই এ ঘটনা নিয়ে দৈনিক ‘সংবাদ’ সম্পাদকীয় লিখেছিল ‘অটোপ্রমোশন এক আত্মঘাতী দাবি’ শিরোনামে। একই দিন ‘ইত্তেফাক’ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ‘আত্মঘাতী দাবি’ শিরোনাম দিয়ে।

 ২১ জুলাই ছিল বাংলাদেশ ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলন। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের এ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘নকল প্রবণতা, বিনা পরীক্ষায় অটোপ্রমোশনের দাবিতে শিক্ষকদের ঘেরাও করে রাখা বন্ধ করতে হবে।’ এই তো আমাদের বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা। মহান জাতির মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। সত্য ও ন্যায়ের পথ চলায় সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকা ধ্রুবতারা।

#

০৬.০১.২০২০ পিআইডি ফিচার